এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ রহস্যের ঘেরাটোপে কোয়াসার
√ খেলতে খেলতে অঙ্ক
√ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
√ বিকল্প শক্তির সন্ধানে
উন্নতচূলা √ আর্যভট্ট ও আমরা

বিজ্ঞান অন্বেষক

আমাদের কথা

বিজ্ঞান অন্বেষক সম্প্রতি সরকারিভাবে (RNI) নিবন্ধীকৃত হয়েছে। তাই এর আগে প্রথম বর্ষে ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও এই সংখ্যাটি প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হল।
—বিজ্ঞান দরবার

বর্ষ -১ | প্রথম সংখ্যা | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি /২০০৪ | দাম ১ টাকা

পাখিদের কথা

নীলকণ্ঠ পাখি সাহিত্যে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একটি অতি পরিচিত নাম। দুর্গাপুজোর বিসর্জনের দিনে এই পাখিটিকে আকাশে ওড়ানোর রেওয়াজ ছিল। কিছুটা মোটাসোটা পায়রার মতো এই পাখিটি সাধারণত চাষের জমির আশেপাশে থাকে। ঘন জঙ্গলে এরা থাকে না। এদের গায়ে নানা বর্ণের পালক থাকে। গলায় পিঠে লাল-মেরুন, ডানায় ঘন নীল, পেটের দিকে হালকা নীল বর্ণের পালক থাকে। মাথায় নীলবর্ণের পালক থাকার ফলে মনে হয় নীল টুপি বসানো আছে। আকাশে ওড়ার সময় নীল রঙটিই দেখা যায়। এদের কণ্ঠস্বর কর্কশ। পুরুষ নীলকণ্ঠ ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করে ডাকে। বসন্ত ঋতুতে এরা গাছে খড়, আবর্জনার টুকরো, পালক দিয়ে বাসা বানায়। পুরুষ পাখিটি

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

গণেশ, নরখুলি দুধ পান করে না

বিশ্বাস : গণেশ, নরখুলি মন্ত্রের সাহায্যে দুধ বা ঐ জাতীয় জলীয় পদার্থ পান করে।

বিজ্ঞান : গণেশ দুধ পান করে না। পান করতে কেউ দেখে নি, দেখেছে চামচের দুধ কমে যাওয়া। চোখে দেখার ভুল, না সত্যিই কোন কোন

এরপর ৬ পাতায়

আমরা কি একা?

পিন্টু আজ সকালে জোর তর্ক জুড়েছে ওর বন্ধু অমলের সঙ্গে। গতকাল পিন্টু একটা হিন্দি ছায়াছবি দেখেছে—'কোই মিল গয়া'। সিনেমার গল্পটা বাইরের থেকে আসা এক জীবকে নিয়ে, তার নাম 'যাদু'। ঘুমানোর আগে পর্যন্ত পিন্টু যাদুর কথা ভেবেছে। রাত্রে যাদুর স্বপ্ন দেখেছে তাই সে আজ উত্তেজিত। তার যুক্তি যাদু যদি নাই থাকে তবে ফিল্মটা হলো কিভাবে? অমলের যুক্তি—শুধু হিন্দিতে নয়, ইংরাজী ভাষায় অনেক ফিল্ম তৈরি হয়েছে E.T., মার্স অ্যাটাক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে ইত্যাদি। ফিল্ম তৈরি হলেই বিষয়টা সত্যি হয় না। তর্কের শেষ হচ্ছে না দেখে দুজনেই ঠিক করলো অনন্ত কাকুর কাছে যাবে। অনন্ত কাকু বিজ্ঞানের শিক্ষক। ছুটির দিনে সাত-সকালে দুই মূর্তিকে আসতে দেখে বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন বিষয়ে এদের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। সব শুনে বললেন—তোমরা দুজনেই ঠিক। আসলে পৃথিবীর বাইরে জীবজগৎ আছে কিনা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। তবে মানুষের অনুসন্ধান থেমে নেই। আজ তোমাদের সেই কথাই বলব।

পৃথিবীর বাইরে প্রাণ আছে কিনা খোঁজার আগে আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। মহাবিশ্ব কত বড়? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা একটু অন্যভাবে দিতে পারি। আমাদের সৌর জগত (সূর্য ও তার গ্রহ) যে গ্যালাক্সির (Galaxy) অন্তর্গত তার নাম মিল্কি ওয়ে (Milky Way)। এই গ্যালাক্সির চেহারা পাক খাওয়া চাকতির মতো। এই গ্যালাক্সির ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। ১ আলোকবর্ষ = এক বছরে আলো যে দূরত্ব যায় (আলো এক সেকেন্ডে প্রায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যায়)। মহাবিশ্বে এইরকম অসংখ্য গ্যালাক্সি আছে। প্রত্যেকটি গ্যালাক্সিতে আমাদের সূর্যের মতো অসংখ্য নক্ষত্র আছে এবং অসংখ্য গ্রহ আছে। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই প্রাণ থাকা সম্ভব। এতক্ষণে মহাবিশ্বের বিশালত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা নিশ্চয় পেয়েছি।

এবারে আসি DNA অণুর কথায়। এর পুরো নাম ডি-অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। এক অসাধারণ যৌগ এই DNA তার মতো আর একটি DNA তৈরি করতে পারে এবং প্রোটিন অণু তৈরি করতে পারে। প্রোটিন হল জীবকোষের অন্যতম গঠনগত উপাদান। বিজ্ঞানীদের মতে এই DNA অণু আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর জীবজগতের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর বাইরে কোথাও প্রাণ থাকলে বাধ্যতামূলকভাবে DNAও থাকবে। এবং অনেক বিজ্ঞানীর মতে DNA অণু তৈরির শৃঙ্খলাবদ্ধ আকস্মিক ঘটনা বারবার ঘটে না। সুতরাং পৃথিবীর

এর পর ২ পাতায়

প্লাজমা

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—পদার্থের এই তিনটি অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু মহাবিশ্ব (Universe)-এর তাবৎ পদার্থের শতকরা নিরানব্বই ভাগেরও বেশি যে অবস্থায় রয়েছে তা'না কঠিন, না তরল, না গ্যাসীয়। তা রয়েছে প্লাজমা (Plasma) অবস্থায়। এটি পদার্থের চতুর্থ অবস্থা নামে পরিচিত হয়েছে। কঠিন পদার্থকে উত্তপ্ত করলে তা প্রথমে তরল এবং পরে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় (ব্যতিক্রম: উদ্বায়ী পদার্থ)। যেমন বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প। ঐ গ্যাসেরই উষ্ণতা যদি আমরা প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিই, তাহলে কি হবে? ঐ

এর পর ৩ পাতায়

নতুন বোতলে পুরানো মদ

সবরকম গুণ এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভাগ্যের দোষে ধন-সম্পত্তিতে একজন বিত্তবান (কেউকেটা) হওয়া গেল না। এমন ধারণা কেউকেটা না হওয়া প্রায় সকলেরই মনে গেঁথে বসে আছে। আর্থিক অনটন, ব্যবসায়ে লোকসান বা চাষবাসে ফসল না হওয়া—সবই তো নসিবের খেলা। এখন আবার চাকরি হওয়া বা না হওয়া সবই তো ভাগ্যের উপর দাঁড়িয়ে। সব ক্ষেত্রেই সফল হওয়ার

এরপর ৫ এর পাতায়

আমরা কি একা ?

১ পাতার পর

বাইরে প্রাণের সম্ভাবনা কম।

সবাই এদের মতো নিরাশাবাদী নন। অনেকেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর বাইরে প্রাণ আছে। গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের নতুন শাখা— এক্সোবায়োলজি। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন দূরবীন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কাজে লাগিয়ে এক্সোবায়োলজিস্টরা প্রাণের সন্ধান করে চলেছেন। একদল পৃথিবীর বুকে পাওয়া বিভিন্ন উল্কার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে জৈব পদার্থের সন্ধান করছেন। উল্কার মধ্যে পাওয়া বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে জৈব পদার্থ গঠনকারী রাসায়নিকের সন্ধান করছেন। আরেকদল সন্ধান করছেন পৃথিবীর বাইরে অনুভূতিশীল বুদ্ধিমান জীবের। এদের বিশ্বাস, সৌর জগতের বাইরে আমাদের গ্যালাক্সি (Milky Way) বা অন্য গ্যালাক্সিতে মানুষের সমকক্ষ বা উন্নত জীব বর্তমান। তাঁরা একটি প্রকল্প গড়ে তুলেছেন যার নাম Search for Extra terrestrial Intelligence সংক্ষেপে SETI।

মনে প্রশ্ন জাগে SETI ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা একটু সহজে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে Phillip Morrison এবং Giuseppe Cocconi সর্বপ্রথম বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে মহাকাশে তথ্য প্রেরণের ব্যাপারে আলোচনা করেন। তাদের এই ধারণা থেকেই গড়ে ওঠে SETI প্রকল্প। পৃথিবীর বাইরে উন্নত জীব আছে এবং তারাও যোগাযোগ করতে চায় এবং তারাও বেতার তরঙ্গকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে এই ধারণার ভিত্তিতে SETI প্রকল্পের কাজ চলে। এই প্রকল্পে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বেতার তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে বিভিন্ন সংকেত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়। এই সংকেতের মধ্যেই খোঁজা হয় ভিনগ্রহবাসীর পাঠানো সংকেত। সংকেত খোঁজার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ২১ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ এই তরঙ্গ মুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নির্গত হয়। পদার্থ বিদ্যার মূল বিষয়গুলি এই মহাবিশ্বের যেকোন স্থানে অপরিবর্তিত থাকে। তাই এটা ধরে নেওয়াই যায়, পৃথিবীর বাইরের বুদ্ধিমান জীবরা এই ব্যাপারটা জানে এবং তার ফলে তারা এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাধ্যমেই সংকেত পাঠাবে। ফ্রাঙ্ক ড্রেক নামের বিজ্ঞানী ৩০০ মিটার ব্যাসের অ্যান্টেনা-র সাহায্যে এই তরঙ্গ ধরার চেষ্টা করছেন।

শুধুমাত্র সংকেত গ্রহণ নয়, পৃথিবীর মানুষ অন্য গ্রহের জীবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে সংকেতের মাধ্যমে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাইওনিয়ার-১০ নামে মহাকাশযানের মধ্যে একটি ফলকের মধ্যে পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্কে তথ্য ছিল। সেই ফলকে এটাও জানানো হয়েছিল আমরা বন্ধুত্ব করতে চাই। অবশ্য এই তথ্যে কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়নি। গণিত, পদার্থ বিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এই সংকেত তৈরি করা হয়েছে। এই সংকেত পাঠানোর সময় কিছু মানুষ আপত্তি জানান যে, এইভাবে আমাদের ঠিকানা মহাবিশ্বে জানানো ঠিক হচ্ছে না। এর ফলে আমাদের নিরাপত্তা নষ্ট হতে পারে। বর্তমানে মাঝে মধ্যে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সংকেত পাঠানো হচ্ছে।

এই মহাবিশ্বে বিভিন্ন গ্রহে যদি প্রাণ থাকে এবং তারা যদি সভ্যতা গড়ে তোলে তবে তার সংখ্যাটা কত? ফ্রাঙ্ক ড্রেক এই সংখ্যাটি নির্ণয়ের জন্য একটি সমীকরণের প্রস্তাব রেখেছেন। সমীকরণটি হল—

$$N = R \times f_s \times f_p \times n_e \times f_i \times f_y \times f_c \times L$$

যেখানে N হল নির্ণেয় সংখ্যা; R হল এই মহাবিশ্বে নক্ষত্র সৃষ্টির গড় হার; f_s হল মহাবিশ্বে গ্রহ সম্বলিত নক্ষত্রের সংখ্যা; f_p হল প্রত্যেকটি গ্রহমণ্ডলে গ্রহের গড় সংখ্যা; n_e হল সেই সব গ্রহের সংখ্যা যাদের ক্ষেত্রে প্রাণের উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা বলয় আছে; f_i হল যেসব গ্রহে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে তাদের সংখ্যা; f_y হল যেসব বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছে তাদের সংখ্যা; f_c হল যেসব গ্রহের জীবরা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তাদের সংখ্যা; L হল ভিনগ্রহের গড়ে ওঠা সভ্যতার আয়ু। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে এই সমীকরণের সমাধান প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মানুষ এত সহজে দমে যাওয়ার পাত্র নয়। তাই এই সমীকরণের সমাধানের জন্য অনেক মান অনির্ণেয় হলেও কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন কিছু গ্রহে নিশ্চয়ই প্রাণ আছে এবং এইসব গ্রহের মোট সংখ্যা হল আনুমানিক এক কোটি।

ভিনগ্রহে জীব থাকার ধারণাকে জোরালো করেছে মঙ্গল গ্রহ থেকে আসা উল্কা খণ্ড। এই উল্কাখণ্ডে পাথর হয়ে যাওয়া খুব ছোট জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহাশূন্যে বিভিন্ন জৈব পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিছুদিন আগে মহাশূন্যে গ্লাইসিন নামে অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া গেছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে তৈরি হয় প্রোটিন যা জীবকোষের উপাদান।

এইসব ঘটনায় উৎসাহী হয়ে ভিনগ্রহে প্রাণের সন্ধানীরা নজর রাখছেন তাদের গ্রাহক যন্ত্রে, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন একটি ডাকের 'আমরা এখানে'।

রাত্রে বিল্টু তারা ভরা আকাশে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো সত্যিই যদি এখন শোনা যেত 'আমরা এখানে'। —*নিজস্ব প্রতিবেদন*

তথ্যসূত্র: Science Reporter, Down to Earth

বিজ্ঞান মেলা

১-৪ জানুয়ারি'০৪ ক্ষুদ্র মোহনপুরে সত্যেন বসু বিজ্ঞানমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু সংস্থাই অংশগ্রহণ করে। কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার এবং চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কর্মীরা অলৌকিক নয় লৌকিক, রঙিন আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সর্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। বিজ্ঞান মেলায় গ্রামবাসীরা খুবই উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন। মতামত ও পরামর্শ অবশ্যই পাঠাবেন।

মুখস্ত বিদ্যা নয়। পরীক্ষা হলে ইংরাজী বানিয়ে লিখে ভাল ফল করুন।
ভর্তি চলিতেছে—IX - XII & Degree.
যোগাযোগ - T. PAUL
বিবেকানন্দ পল্লী, নবনগর, হালিশহর ও রুচিরা হোটেলের পাশে, থানা মোড়, কাঁচরাপাড়া। ফোন: ৯৮৩১৪২২৭১৯

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

প্লাজমা

১ পাতার পর

গ্যাস যে অবস্থা প্রাপ্ত হবে সেটিই প্লাজমা। ইংরেজ বিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্রুক্স্ সর্বপ্রথম এই অবস্থাটির প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দুজন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী ল্যাংমুইর এবং টংক্স (Langmuir and Tonks) সর্বপ্রথম 'প্লাজমা' শব্দটি ব্যবহার করেন।

একটি পরমাণু সামগ্রিকভাবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ। তাপ প্রয়োগে বা অন্য কোনও উপায়ে যদি পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন বহিষ্কৃত করা যায় তাহলে পরমাণুটিতে পজিটিভ চার্জের পরিমাণ নেগেটিভ চার্জের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়। এ অবস্থায় পরমাণুটিকে বলছি পজিটিভ আয়ন। এরকম বহু সংখ্যক আয়ন ও সমসংখ্যক বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশের নাম প্লাজমা। প্লাজমার মধ্যে নিরপেক্ষ পরমানু থাকতে পারে না, ভেঙ্গে আয়নে পরিণত হয়। পজিটিভ আয়ন ও বন্ধনমুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা অবশ্যই সমান থাকে। এ অবস্থায় প্লাজমাকে বলা হবে 'বিশুদ্ধ প্লাজমা'।

গ্যাসের সঙ্গে প্লাজমার পার্থক্য বিস্তর। সাধারণ অবস্থায় গ্যাস তড়িৎ পরিবহন করতে পারে না, প্লাজমা পারে। প্লাজমার মধ্যে বহুসংখ্যক আহিত (Charged) কণার উপস্থিতির জন্যই এটা সম্ভব হয়। তড়িৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গেও প্লাজমা ক্রিয়া করতে পারে। গ্যাসে ভ্যানডারওয়াল বল প্রবল ও নিকট পাল্লার। প্লাজমাতে কুলম্বীয় বল দুর্বল ও দূর পাল্লার। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে প্লাজমা প্রবল প্রতিক্রিয়া করে।

প্লাজমার ব্যাপক অস্তিত্ব : আগেই বলেছি, মহাবিশ্বের সমগ্র পদার্থের ৯৯ শতাংশেরও বেশি প্লাজমা অবস্থায় রয়েছে। সকল নক্ষত্র, আন্তর্নক্ষত্র মহাকাশের অধিকাংশ এলাকা, নীহারিকা, গ্রহের আবহমণ্ডলের অংশবিশেষ, সৌর বায়ু (Solar Wind), সৌর প্রজ্বাল (Solar Flare), মেরুপ্রভা (Aurora), আমাদের আয়নমণ্ডল, ভ্যান এ্যালেন বিকিরণ বেষ্টনী প্রভৃতি রয়েছে প্লাজমা অবস্থায়। জ্বলন্ত ফ্লুওরেসেন্ট ল্যাম্পের ভিতরের বেশির ভাগ অংশই থাকে প্লাজমা অবস্থায়। বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত নিয়ন বাতিতে গ্যাস বৈদ্যুতিক উপায়ে প্লাজমা অবস্থায় পৌঁছায়।

প্লাজমার ব্যবহার : সূর্যের প্রচণ্ড শক্তির মূলে রয়েছে সূর্যের অভ্যন্তরে প্লাজমা মাধ্যমে হাইড্রোজেনের সংযোজন প্রক্রিয়া। কৃত্রিম উপায়ে নিউক্লিয়াসের সংযোজনজনিত শক্তিও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে। হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে নির্গত শক্তির কথা আমরা জানি। কৃত্রিম উপায়ে প্লাজমা তৈরি করে তার মধ্যে নিয়ন্ত্রিতভাবে নিউক্লিয় সংযোজন ঘটাতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডয়টোরিয়াম থেকে সংযোজন প্রক্রিয়ায় যে শক্তি পাওয়া যেতে পারে তা ৩৫০ লিটার পেট্রোলের শক্তির সমান। জীবাশ্ম জ্বালানীর ভাণ্ডার যখন নিঃশেষিত হওয়ার পথে তখন এ ধরনের সম্ভাবনা আমাদের আশার আলো দেখায়। MHD (Magneto Hydro Dynamic) জেনারেটরে প্লাজমার তাপশক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই যন্ত্রের কর্মদক্ষতা শতকরা ৬০, যা প্রচলিত জেনারেটরের থেকে বেশি। দীর্ঘকালব্যাপী মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে প্লাজমা চালিত রকেট বিশেষ উপযোগী। এধরনের রকেট সহজেই কক্ষপথ পরিবর্তন করতে পারে।

প্লাজমার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরি হয়েছে প্লাজমা টর্চ, প্লাজমা জেট, প্লাজমা বুলেট। প্লাজমা টর্চ থেকে আলোর পরিবর্তে উষ্ণ প্লাজমা নির্গত হয়। প্লাজমা জেট থেকে অত্যুষ্ণ প্লাজমা নির্গত হয় যার তাপমাত্রা প্রায় ৩০,০০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ধাতব পদার্থের সঙ্গে সেরামিক যুক্ত করা, ইস্পাত কেটে ফেলা প্রভৃতি নানা কাজে প্লাজমা জেট ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্লাজমা গান থেকে নিক্ষিপ্ত প্লাজমা বুলেটের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২০ মাইল। চৌম্বক ক্ষেত্র এই বুলেটের আকার বদলে দেয়। পরিবর্তিত আকারের বুলেটের নাম প্লাসময়েড। নক্ষত্র সৃষ্টি রহস্যের পর্দা উন্মোচনে প্লাসময়েড সম্পর্কিত গবেষণা সাহায্য করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

ক্ষুদ্রকার 'কৃত্রিম সূর্য' ও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এটি সংযোজন চুল্লী (Fusion reactor)। নাম টোকাম্যাক (Tokamak)। রুশ ভাষায় সংক্ষেপিত শব্দ; সম্পূর্ণ নাম 'Toroidalnaya Kamera i magnitnaya Katushaka' অর্থাৎ বলয়াকৃতি আধার ও চৌম্বক কুণ্ডলী (Toroidal Chamber and magnetic Coils)। এটি উদ্ভাবন করেন সোভিয়েট পদার্থবিদ লেভ্ এ্যানড্রিভিচ্ আর্টসিমোভিচ্ ১৯৬৮ সালে। টোকাম্যাকে ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়ামের মতো হাল্কা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সংযোজনের ফলে বিপুল শক্তির উৎপাদন সম্ভব। শক্তিসংকট সমাধানে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্লাজমা সম্পর্কিত গবেষণা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানব কল্যাণে প্লাজমা ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত হচ্ছে।

—গোবিন্দ দাস

ফোন : ২৫৮৯-১৫১২

পাখি : নীলকণ্ঠ

১ পাতার পর

সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার জন্য আকাশে রকেটের মতো সোজা উঠে যায় তারপর ডিগবাজী খেয়ে মাটির কাছাকাছি নেমে আসে আবার উঠে যায়। এইভাবে এরা সঙ্গীকে আকৃষ্ট করে। ওড়ার সময় ডানা ঝাপটালে উজ্জ্বল নীল রঙ ঝলসে ওঠে। সঙ্গীকে আকৃষ্ট করার পরে এরা জোড়ায় জোড়ায় গাছের ডালে বসে ডানা ঝাপটায় আর আওয়াজ করে। বাসায় স্ত্রী পাখি চকচকে সাদা, গোল ৩-৫টি ডিম পাড়ে।

নীলকণ্ঠ পাখি

নীলকণ্ঠ পাখি চাষীর উপকারী বন্ধু। চাষের জমির পাশে গাছের ডালে এরা চুপ করে বসে থাকে এবং তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চারপাশে নজর রাখে। কোথাও পোকা-মাকড় দেখতে পেলেই সোজা নেমে আসে এবং পোকাটাকে ঠোঁটে নিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসে। চাষের জমির পোকা-মাকড় এদের মূল খাদ্য হলেও ছোট ব্যাঙ, গিরগিটি, ইঁদুরও এরা খায়। তবে এদের ধরে খাওয়ার আগে গাছের ডালে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলে। পোকা-মাকড় খেয়ে ফসল রক্ষা করে বলে গ্রামাঞ্চলে এই পাখিটিকে সবাই ভালবাসে।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

আর্যভট্ট ও আমরা

জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এক করে দেবার যে প্রয়াস, সাথে মাদারকে সন্ত বানানোর প্রক্রিয়া, এছাড়া মালদায় খাজা বাবার সাথে বীরভূমের আয়না বাবাদের দাপাদাপি—আর এর বিরুদ্ধে 'একমাত্র ভরসা জাগানোর' রাত দশটার মিডিয়া—সবমিলিয়ে কোনটা নেব কোনটা নেব না এই ভাবনা-চিন্তায় মানুষ বিভ্রান্ত। আসলে দেশে যখন প্রকৃত লড়াই আন্দোলন সংগঠিত হয় না তখন মানুষ পত্র-পত্রিকা এবং মিডিয়ার ওপর একটু বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই সময়ে একমাত্র পথ প্রদর্শক হতে পারেন সেই সব ব্যক্তিত্ব যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞানসাধনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরি করেছেন বা করছেন।

আর্যভট্ট ছিলেন এইরকম একজন মানুষ। ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞানের বহু ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকের কাছে আর্যভট্ট সম্পর্কে প্রশ্ন করে খুব একটা বিস্তারিত জানতে পারিনি। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এতটুকুই শিক্ষা দেয় যা দিয়ে শুধু প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

আমরা রাতের বেলা আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাই অসংখ্য তারা মিটমিট করে জ্বলছে। সেই তারা, ছায়াপথ, সূর্য, চাঁদ সবকিছু সম্পর্কে কৌতূহল আমাদের সকলেরই। মহাকাশে এই সব অজানা জ্যোতিষ্ক, গ্রহ, নক্ষত্র সম্পর্কে জানবার জন্য বহু দেশ, বহু সময়ে বহু উপগ্রহ পাঠিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে মহাকাশে প্রথম যে উপগ্রহটি পাঠান হয় তার নাম ছিল আর্যভট্ট। যাঁর নাম স্মরণ করে এই উপগ্রহের নামকরণ করা হয়েছিল তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী। আর্যভট্ট ছিলেন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ। তাঁর জীবন ও পরিবার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় নি। শুধু এটুকু জানা গিয়েছিল যে, কেরালা রাজ্যের কোনও এক গ্রামে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিশোর বয়সে আর্যভট্ট পড়াশুনা করবার জন্য বনজঙ্গল, পাহাড়-পর্বত পার হয়ে নালন্দায় এসেছিলেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসে খুব অল্পদিনের মধ্যেই আর্যভট্ট অধ্যাপকদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে যা কিছু সত্য বলে প্রমাণিত হত তা তিনি খুব জোর গলায় সবার সামনে প্রকাশ করতেন। কিন্তু সে সময় বিজ্ঞানের তুলনায় ধর্মের প্রভাবই ছিল বেশি। তাই কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে হত তা কোনও মানুষই মেনে নিতে পারতেন না। সেই সময়ে ভারতবর্ষে রাজত্ব করতেন গুপ্ত বংশের রাজারা। গুপ্তরাজা বুদ্ধ গুপ্ত আর্যভট্টকে নানা বিষয়ে উৎসাহ দিতেন এমনকি আর্যভট্টের গবেষণার ফলাফল জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করে দিতেন। তৎকালে গ্যালিলিওকে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল কিন্তু আর্যভট্টকে কোনওরকম শাস্তি বা অপমান সইতে হয়নি। এর ফলে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান সেদিন বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল।

সময়টা ৪৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২১ মার্চ, আর্যভট্ট গবেষণা করে কতগুলো নতুন কথা জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করলেন। প্রাচীন ভারতের সকলেরই ধারণা ছিল সৌরজগতের কেন্দ্রে নাকি পৃথিবীর অবস্থান আর সূর্য তার চারপাশে বন বন করে ঘুরে চলেছে। আর্যভট্ট বললেন ঠিক উল্টো কথা অর্থাৎ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে। নিজের অক্ষের চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে বলেই একই নিয়মে দিন-রাত হয়ে চলেছে। আগে মানুষের ধারণা ছিল রাহু চাঁদ-সূর্যকে খেয়ে ফেলে বলেই নাকি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। কিন্তু আর্যভট্ট বললেন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া ও পৃথিবীর ওপর চাঁদের ছায়া পড়ে বলেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত হয় এই বিষয়টিও তুলে ধরেন আর্যভট্ট।

আর্যভট্ট-র বিখ্যাত সেই বই 'আর্যসিদ্ধান্ত'-এর প্রকাশ ৪৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২১ মার্চ। এই বইখানি শেষ করতে আর্যভট্ট-র প্রায় দশ-বারো বছর সময় লেগেছিল। এই বইটিতে তিনি প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণনাকারদের মতামত গ্রহণ করলেও নিজের সিদ্ধান্তের কথাই বেশি লিখে গিয়েছেন।

'আর্যসিদ্ধান্ত' বইটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়টির নাম 'দশ গীতিকা'। এখানে শ্লোকের মাধ্যমে গণিতের বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করবার একটি সুন্দর পদ্ধতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম 'গণিতপদ'। এখানে তেত্রিশটি শ্লোক রয়েছে। আর রয়েছে নানা ধরনের অঙ্ক। আর কিছু অঙ্কের সূত্রের কথাও এই অংশে সুন্দরভাবে বলা আছে। তৃতীয় অধ্যায়টির নাম 'কাল ক্রিয়াপদ'। এখানে শ্লোকের মাধ্যমে কি করে সময়ের হিসেব গণনা করা যায় তা লেখা আছে। এই অংশে শ্লোকের সংখ্যা প্রায় পঁচিশটি। চতুর্থ অধ্যায়টির নাম 'গোলাপদ'। এই অংশে পঞ্চাশটির মত শ্লোক আছে। সবকটি শ্লোকই গোলকসম্বন্ধীয় তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।

আর্যভট্ট তাঁর 'আর্যসিদ্ধান্ত'-এর মধ্য দিয়ে বহু প্রাচীন ধারণা বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি আর একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন যা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ছয় মাস বাদে দুটি দিন-রাত্রি সমান হয়। তারিখ দুটি হল, ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর। এই আশ্চর্য ঘটনার ব্যাখ্যাও তিনি করেছিলেন।

'এপিসাইকেল' জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমির 'এপিসাইকেল' তত্ত্বের সাহায্যে গ্রহদের তুলনায় আর্যভট্টই প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রহরের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এছাড়াও গণিতের বিভিন্ন শাখায় আর্যভট্টের অজস্র অবদান রয়েছে। জ্যামিতির বহু নতুন তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। পাই রাশিটির জনক ছিলেন আর্যভট্ট। আধুনিক গণিতজ্ঞেরা পাইয়ের যে মান পরবর্তীকালে বের করেছেন তা আর্যভট্টের নির্ণীত মানের সঙ্গে সমান। পরিমিতি, বর্গমূল, ঘণমূল, প্রগতি ইত্যাদি নানা তত্ত্বের আলোচনা আর্যভট্ট বহুদিন আগেই করে গেছেন। পরবর্তীকালে আধুনিক গণিতজ্ঞেরা এই সমস্ত আবিষ্কার সাদরে গ্রহণ করেছেন।

হাজার দেড়েক বছর আগে এমন একজন আধুনিক চিন্তা-ভাবনার

এরপর ৫ এর পাতায়

নতুন বোতলে পুরানো মদ

১ পাতার পর

জন্য অর্থাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার জন্য জ্যোতিষীদের রত্ন-পাথরের ব্যবসা তো ছিলই; প্রতিযোগিতার বাজারে জ্যোতিষীদের পুরাতন ব্যবসাকে টক্কর দিতে বাজারে হাজির 'ফেং শুই'। ভণ্ডামির পোষাক বদল; আগে ছিল সাদা, গেরুয়া বা লাল আলখাল্লা আর লাল তিলক, এখন সেটা একটু আধুনিক। নতুন মোড়ক, আবার সেটা বিদেশাগত— তাহলে তো কথাই নেই—'সুস্বাগতম'। প্রকৃতপক্ষে চাকরি না হওয়া বা ব্যবসায়ে লোকসান— এধরনের সমস্যাগুলিকে আমরা ব্যক্তিগত সমস্যা হিসাবে ধরে নিই। আসলে এগুলি সামাজিক (দেশীয়) সমস্যারই ছোট্ট উদাহরণ মাত্র।

জ্যোতিষ বা ফেংশুই আসলে কি করতে চায়? ওরা চায় ভাগ্য মেরামত করতে অর্থাৎ খারাপ ভাগ্যকে ভাল ভাগ্য করতে। ভাগ্যের দোষে, নসিবের খেলায় আমরা যা পাচ্ছিলাম না, সেগুলি যদি পেতে চাই তাহলে ভাগ্যকে মেরামত তো করতেই হবে। ভাগ্যকে যদি সারিয়ে নিতে পারি তবেই তো মনের মত জীবন পাওয়া যাবে। ভণ্ডামির পাশাপাশি তর পাশে আর এক হাতিয়ার 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু'—এরকম কঠিন, দৃঢ় বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে জমিয়ে ব্যবসা বাড়াচ্ছে, বাবাজী থেকে শুরু করে জ্যোতিষী, তারপর ফেংশুই বিশেষজ্ঞরা।

ফেংশুই কি জিনিস, কতটাই বা তার গ্রহণযোগ্যতা? ফেংশুই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'জল আর বাতাসের বিজ্ঞান'। সে যে ভাষাতেই হোক, তার মজ্জায় 'বিজ্ঞান' তো। আর এই বিজ্ঞান শব্দটা রাখতে পারলে ব্যবসা যে ভাল হবেই তা আমরা বুঝতে পারি। জ্যোতিষকে বিজ্ঞানের তকমা লাগিয়ে হাজির করার যে নোংরা চেষ্টা চলেছিল সেটা থেকেই ব্যাপারটা পরিষ্কার। পরিস্থিতি যা, তাতে সবাই হাবেভাবেই পরিষ্কার বলতে চাইছে আমরা বাঙালি, আমরা মানে না বুঝেই এই বিদ্যার সাহায্যে আমাদের ভাগ্য মেরামত করাতে চাই। কিন্তু কিভাবে ভাগ্য মেরামত করে এই শাস্ত্র তা দেখা যাক—

ফেংশুই মতে মানুষের তিনটি ভাগ্য। ১) স্বর্গীয় ভাগ্য—মানে গ্রহ-নক্ষত্রের যে প্রভাব মানুষের ওপর থাকে; ২) মনুষ্যভাগ্য—মানুষ পরিশ্রম আর ক্ষমতায় যে ভাগ্য অর্জন করে থাকে; ৩) ভূ-ভাগ্য—এই ভাগ্য তৈরী হয় মানুষের কাজের জায়গা ও থাকার জায়গা নিয়ে, যা সহজেই পরিবর্তনযোগ্য। এবং অন্য দুটি অর্থাৎ স্বর্গীয় ও মনুষ্যভাগ্য অপরিবর্তনীয়। ভূ-ভাগ্য পরিবর্তনযোগ্য, তাই একে (ভূ-ভাগ্য) নিয়েই ফেংশুই শুরু করে তার কেরামতি। এছাড়াও ফেংশুই মতে পাঁচটি মৌলিক উপাদান বর্তমান। সেগুলি হল—জল, আগুন, মাটি, বাতাস আর কাঠ। তাহলে বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি জিনিসকে নিয়ে ভূ-ভাগ্য পরিবর্তন করা হবে। এগুলিকে (পাঁচ মৌলিক উপাদান) কাজের ও থাকার জায়গাতে ঠিক ঠিক দিকে বসাতে হবে। তাই ফেংশুই হিসেব কষার জন্য দশটি দিক। এবার 'পা-কুয়া' ছকে পাঁচ মৌলিক উপাদান আর দশ দিক মিলিয়ে হিসাব (!) কষে থাকার ও কাজের জায়গার সঠিক রূপ দেওয়া হবে এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে।

হিসেব কষা শেষ, এবার ফলাফল—'দক্ষিণ দিকে জলাশয় রাখা মঙ্গলজনক। শহরে বসবাস, পুকুর খননের অবস্থা নেই, কি হবে? দরকার নেই, বাথরুম-চৌবাচ্চা দক্ষিণ দিকে বানাবেন, তাও যদি সম্ভাবনা হয় একটা জলের পাত্র কিন্তু রাখবেন দক্ষিণদিকে— ভাগ্য খুলতে বাধ্য। উত্তরে ধাতু রাখা চাই। উত্তরে কিন্তু রান্নাঘর কোনওভাবেই চলবে না, কেননা আগুন ধাতুকে গলিয়ে দেয়, তাহলে গলে যাবে আপনার ভাগ্যও। নিশ্চয় সেটা কাম্য নয়। এসব আসে বিশেষজ্ঞদের হিসাব থেকে। কিন্তু আপনি বিশেষজ্ঞদের হিসাব পেতে অপারগ, তবে কি আপনাকে বঞ্চিত হতে হবে ফেংশুই-এর আর্শীবাদ থেকে? কখনই না, সেজন্য বাজারে আছে চীনের কারখানার তৈরি 'ফেংশুই'-এর নমুনা জিনিসপত্র। যেমন হাজির আছে হাস্যরত বুদ্ধ, তিন পা ওয়ালা ব্যাঙ, কমলালেবু গাছ, স্ফটিক গ্লোব ইত্যাদি। সংগ্রহ করুন যে কোনও মূর্তি এবং সেটি বাড়ীতে সঠিক জায়গায় রাখতে পারলেই ভাগ্য সেরে উঠবে তাড়াতাড়ি।

আজ আর ফেংশুই বিশেষজ্ঞরা শুধু চেম্বার নয়, হাজির সমস্ত রকম গণমাধ্যমে; সংবাদপত্রই বলুন বা টিভির পর্দা। জ্ঞান বিলোচ্ছেন আর পথ দেখাচ্ছেন বা টোটকা দিচ্ছেন। চীন দেশ থেকে (ভাল একটা প্যাকেটে) পাঠানো হাস্যরতম বুদ্ধ বা অন্য কোনও ফেংশুই মূর্তি, সেগুলি এখন ভাগ্য পরিবর্তনের সহজ অস্ত্র। কিন্তু এত ফেংশুই বিশেষজ্ঞরা আসল কোথা থেকে? এদের তো চীন থেকে পাঠায়নি। প্রকৃতপক্ষে এই ফেংশুই বিশেষজ্ঞরা অকারণে ফেংশুই বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেনি। একদিকে নতুন মোড়কে প্রায় একই 'ভণ্ডামি' ব্যবসা, অন্যদিকে অমৃতলালদের প্রভাবে এদের জ্যোতিষী ব্যবসাটা ভাল চালাতে না পারায় এরা ফেংশুই বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে; একেবারে রাতারাতি।

এপ্রসঙ্গে বলতেই হয়—যুগ এবং পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার কথা। বিজ্ঞানমনস্কতাকে অবহেলা করছে, রত্ন-পাথর বা ফেংশুই মূর্তি নিয়ে বসে আছে, এপর্যন্ত তাও মানা যায়, কিন্তু এই ভণ্ডবাজরাই যখন ঠাণ্ডা ঘরে বসে বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে বক্তৃতা দেয়— তখন মনে হয় না ঘর থেকে টেনে বার করে গাছতলায় বসিয়ে দিই? পরিস্থিতি যত বদলাচ্ছে এরাও সুদৃশ্য নাম আর হিসাবের (!) দোহাই দিতে শুরু করেছে। আবার গ্রাহকদের দিকে তাকালেও একই সুর পাওয়া যাবে। জ্যোতিষ বা আংটি, তাবিচ, কবচ, মাদুলি, যজ্ঞ, দণ্ডিকাটা বা ঝাড়ফুঁক, এসবে বিশ্বাস থাকলেও আজকাল মেনে চলতে বেশ লজ্জাবোধ হয়। কেমন যেন পুরানো-পুরানো গন্ধ। সেই আধুনিক বাজারে ফেংশুই বেশ ছিমছাম আর যুগোপযোগী। নতুন প্যাকেট কিন্তু একই দাওয়াই— ভাগ্য মেরামত। বুক ফুলিয়ে বলাও যায় আবার ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হয়। অর্থাৎ সাপও মরল অথচ লাঠিও ভাঙল না।

—পান্নালাল মনি

ধরমপুর হোস্টেল, মাঝিপাড়া।

আর্যভট্ট

৪ পাতার পর

মানুষ যে কি করে এত সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন তা ভাবতে গেলে আমাদের খুব অবাক লাগে। দুঃখের বিষয় তাঁর লেখা কোনও বই ভারতে পাওয়া যায়নি। আর্যভট্টের সমস্ত রচনাই আরব দেশে পাচার হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানী ফর্ণে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে লেইডন শহর থেকে আর্যভট্টের প্রথম বই আর্যসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

ধর্মদ্বারা পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছোটো লাইনকে আরও ছোটো প্রমাণ করতে গিয়ে আর্যভট্ট একটি বড় লাইন টেনেছেন। আসলে প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা ধর্মীয় ভাবাবেগকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এইভাবেই লড়াই করে চলেন।

—বিবর্তন ভট্টাচার্য (বিজ্ঞান কর্মী)

গণেশ দুধ পান করে না

১ পাতার পর

ক্ষেত্রে খাওয়ানোর সময় চামচের দুধ কমেছে। তা গণেশের খাওয়ার কারণে নয়, সামান্য কাত হয়ে থাকা চামচের দুধ সবার অলক্ষ্যে নিচে পড়েছে। সাম্য অবস্থায় এক চামচ ভর্তি দুধ ধরে রাখা সম্ভব নয় একটু কাত হবেই এবং দুধ পড়বেই। তবে এভাবে পুরো চামচের দুধ কখনো কমবে না। তরল পদার্থের ধর্ম—পৃষ্ঠটান, সান্দ্রতা (Viscosity) এবং কৈশিক (Capillary) ক্রিয়া। এই সব ধর্মের জন্য চ্যাপ্টা চামচ ভর্তি দুধ কাত না করিয়ে কোনো কিছুর গায়ে ছোঁয়ালে তার আকর্ষণী ক্ষমতা বলে ঐ বস্তু দুধকে আকর্ষণ করবে (দুধের পৃষ্ঠটান কম অর্থাৎ নিজেদের অনুর মধ্যে আকর্ষণ বেশ কম) এবং চামচের দুধ গড়িয়ে নিচে পড়বে। তরল পদার্থের ধর্মই হল একফোঁটা পড়তে থাকলে আর এক ফোঁটাকে টানা। অবশ্য চামচের ভিতরটা গভীর হলে এই ধর্ম কার্যকর করা কষ্টকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণেশের মূর্তিগুলি ছিদ্রযুক্ত আগ্নেয় শিলা অথবা পাললিক শিলা দিয়ে তৈরি। এই সমস্ত পাথরে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জল, দুধ জাতীয় পদার্থ শোষণ করতে পারে। এমনিতেই ঐ সমস্ত পাথরের ভিতরে যে ছিদ্র থাকে তার ভিতরকার জলীয় বাষ্প শুকিয়ে শূন্যতার সৃষ্টি হয়। দুধ বা জল ঢাললে ঐ ছিদ্র সহজেই টেনে নেয়। পাথরটাকে প্রয়োজনীয় তাপ দিলে ঐ জল বাষ্প হয়ে বেরিয়ে যাবে।

নরখুলি বা মরার খুলিও কখনোই দুধ বা ঐ জাতীয় কোনো তরল পদার্থ পান করে না। যেটা দেখানো হয় সেক্ষেত্রে কৌশল থাকে গ্লাসে। এক্ষেত্রে গ্লাসটি যা নেওয়া তা দেখতে একটা হলেও প্রকৃতপক্ষে দুটো গ্লাস। একটি ছোট অন্যটি একটু বড়। দুটি গ্লাসই স্বচ্ছ ও প্লাসটিকের (একই রঙের) যা একটি অন্যের মধ্যে সহজেই ঢুকতে পারে। ছোট গ্লাসের তলায় থাকে একটা ফুটো এবং বড় গ্লাসের কানার কাছে থাকে আর একটা ফুটো। এরপর ছোট গ্লাসটিকে বড়টার মধ্যে রাখা হয়। গ্লাসদুটোর ব্যবস্থা এমনভাবে থাকে যেন দুটো গ্লাসের কানা জুড়ে যায় যাতে করে বাইরের থেকে বাতাস কোনওক্রমে না ঢুকতে পারে। এভাবে গ্লাস দুটোকে রেখে ছোট গ্লাসের মধ্যে দুধ বা ঐ জাতীয় কোনও তরল পদার্থ ঢাললে দেখা যাবে যে ছোট গ্লাসের ফুটো দিয়ে দুধ দু'গ্লাসের মধ্যে জমা হবে। এবার বড় গ্লাসের কানার ফুটো সেলোটেপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। এরপর গ্লাসটা উপুড় করে দিলে ছোট গ্লাসের দুধ পড়ে যায় কিন্তু দু'গ্লাসের মধ্যের দুধ থেকে যায়। এরপর নরখুলিটার মুখ গ্লাসে ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র (মন্ত্রের নামে করে যা খুশি কিছু বলা) বলতে বলতে সেলোটেপটি খুলে ফেলা হয়। ফলে বাইরের বাতাসের চাপে দু'গ্লাসের মধ্যবর্তী দুধ ছোট গ্লাসের ফুটো দিয়ে নিচে জমতে থাকে। দু'গ্লাসের মধ্যের দুধ এবং ছোট গ্লাসের দুধ একই সমতলে না আসা পর্যন্ত একাজ চলতে থাকবে। আর দর্শককে তখনই দেখানো হয় সামান্য তলানিটুকু পড়ে আছে বাকী দুধ সবই নরখুলি পান করেছে।

—শুভঙ্কর ঘোষ
অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি
হরিণঘাটা, ফোন : ২৫৮২-১১২৯

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

এশিয়ার বুনো গাধা আগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে পাওয়া যেত। বর্তমানে এদের কেবলমাত্র গুজরাটের কচ্ছের রাণে পাওয়া যায়। ঘোড়ার থেকে সামান্য ছোট কিন্তু গৃহপালিত গাধার থেকে আকারে বড় এই বুনো গাধার বিজ্ঞানসম্মত নাম *Asinus hemionus Khur* । এদের গায়ের রঙ ধূসর থেকে গাঢ় বাদামী হয়। পেটের দিকে সাদা ছোপ লক্ষ্য করা যায়। এদের কানগুলো বড় এবং কানের প্রান্ত কালো। কালো কেশর পিঠের উপর দিয়ে লেজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই প্রাণীটি বুনো ঝোপ ও ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। অতীতে এদের সংখ্যা ছিল প্রচুর কিন্তু বর্তমানে এদের সংখ্যা কয়েকশোতে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের বসবাস স্থলে গৃহপালিত গবাদি পশু অত্যাধিক হারে আসার জন্য খাদ্যের অভাব ঘটেছে। এছাড়া এই সব পশুর মাধ্যমে ছড়ানো রোগের ফলেও এদের সংখ্যা আজ কমে গেছে।

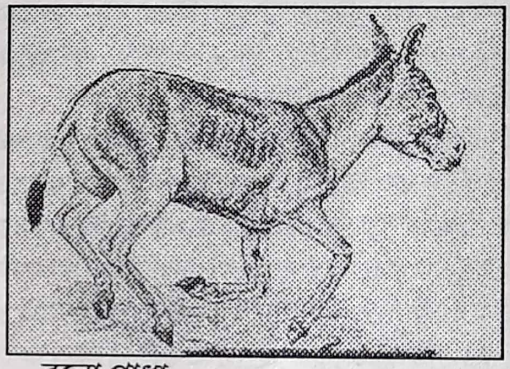

বুনো গাধা

রহস্যের ঘেরাটোপে কোয়াসার

আলো চলে ঢেউয়ের আকারে। এর নাম আলোক তরঙ্গ। এটি একরকমের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। বেতার তরঙ্গও আলোর মতনই একধরনের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। আলো দর্শনের অনুভূতি জাগায়, বেতার তরঙ্গ জাগায় না। শুধু বেতার দূরবীক্ষণ (Radio Telescope) যন্ত্রের সাহায্যে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই বেতার তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ১ সেমি থেকে ৬০০ মি. পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশ ও মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তু থেকে বেতার তরঙ্গ নির্গত হয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। আর এই বেতার তরঙ্গের উৎস খুঁজতে গিয়ে ধরা পড়ে অত্যাশ্চর্য এক মহাজাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব। নাম কোয়াসার।

১৯৩২ সালের ঘটনা। কার্ল ইয়ানস্কি, বিখ্যাত বেতার ইঞ্জিনিয়ার আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবরেটারিতে কর্মরত। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দিক থেকে বেতার দূরবীনের সাহায্যে বেতার তরঙ্গের আগমন বার্তা পেলেন। অভিজ্ঞ ইয়ানস্কির বুঝতে ভুল হয়নি যে এর উৎস কোন পরিচিত বস্তু বা ঘটনা নয়। বেতার তরঙ্গটি আসছিল আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের (Milky way Galaxy) কেন্দ্রস্থলের দিকে অবস্থানকারী স্যাজিটারিয়াস নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে (Sagittarius Constellation)। ১৯৩৩ সালে ৫ মে তার এই ঘোষণা 'New York Times' সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হল। কিন্তু তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিষয়টিকে

এরপর ৮ পাতায়

খেলতে খেলতে অঙ্ক

পূর্বের সংখ্যায় আলোচনাতে এক জায়গায় আমাদের $1^2+2^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ লিখতে হয়েছিল যার সাধারণ প্রমাণ এই সংখ্যায় প্রকাশের জন্য প্রতিজ্ঞ ছিলাম। এখন সরাসরি সেই আলোচনায় প্রবেশ করি।

প্রথমে আমরা দেখাবো $1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

ধরি $s=1+2+\ldots+(n-1)+n$

$s=n+(n-1)\ldots+2+1$

যোগ করে $2s=(n+1)+(n+1)+\ldots n$ পদ পর্যন্ত।

$=n(n+1)$

সুতরাং $s=\frac{n(n+1)}{2}$ সুতরাং $1+2+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$ প্রমাণিত।

এবার আমরা দেখাবো $1^2+2^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

$1^2+2^2+\ldots+n^2$ শ্রেণীটির r তম পদ ধরি t_r

সুতরাং $t_r=r^2=r(r+1)-r$

$=\frac{r(r+1)\{(r+2)-(r-1)\}-r}{3}$

$=1/3\ \{r(r+1)(r+2)-(r-1)r(r+1)\}-r$

$=1/3\ (v_r-v_{r-1})-r$ [$r(r+1)(r+2)=v_r$ ধরি,

সুতরাং $v_{r-1}=(r-1)r(r+1)$]

সুতরাং $t_1=1/3\ (v_1-v_0)-1$

$t_2=1/3\ (v_2-v_1)-2$

$t_3=1/3\ (v_3-v_2)-3$

.....

.....

$t_n=1/3\ (v_n-v_{n-1})-n$

যোগ করে, $t_1+t_2+t_3+\ldots+t_n=1/3\ (v_n-v_0)-(1+2+3+\ldots+n)$

$=1/3\ n(n+1)(n+2)-\frac{n(n+1)}{2}$

$=n(n+1)\left(\frac{n+2}{3}-\frac{1}{2}\right)$

$n(n+1)\left(\frac{2n+4-3}{6}\right)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

শোভন বসু ২৪০৫-১১০৩

মরণোত্তর দেহদান

গত ১৬ জানুয়ারি হরিণঘাটা ব্লকের উত্তর রাজাপুর গ্রামের প্রয়াত ডাঃ সুশীল রায় (৫২) এর দেহ হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটির সদস্যরা সংগ্রহ করে কলকাতা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগে পাঠিয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকারীভাবে জানিয়েছেন প্রয়াত শ্রী রায়ের দেহ চিকিৎসার গবেষণার স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। প্রয়াত রায়ের পরিবারের সদস্যরা এই দেহদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। উক্ত সংস্থা মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিকল্প শক্তির সন্ধানে

উন্নতচূলা

সম্প্রতি ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তিমন্ত্রক (লোদি রোড, নয়াদিল্লী) শক্তির উৎস বিষয়ে একটি পুস্তিকা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে। শক্তি সমস্যা একটি জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানকল্পে মানুষ যাতে কিছু ভাবতে পারেন বা করতে পারেন তার জন্য পুস্তিকাটির কয়েকটি পাতা পর্যায়ক্রমে ছাপা হবে। পাঠকদের মতামত জানাতে অনুরোধ করছি। —সম্পাদক

আমাদের দেশের গ্রামবাংলায় রান্নাঘরের দায়িত্বটা সামলান প্রধানতঃ মেয়েরাই। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগই বাস করেন গ্রামাঞ্চলে। আর রান্নাঘরে রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে কাঠ, কয়লা, গোবর ইত্যাদির ব্যবহারই বেশি। এর থেকে স্বাবাবিকভাবেই প্রচণ্ড ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। আর এই ধোঁয়ার প্রভাবে হাঁপানি, কাশি এবং ফুসফুসজনিত নানারকম ভয়ঙ্কর রোগের সৃষ্টি হয়। তাই ধোঁয়ার প্রভাবমুক্ত একটা রান্নাঘরের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

উন্নাতচূলা জিনিসটা কি?

ধোঁয়াবিহীন, অধিক তাপযুক্ত একটি চূলা। সবসময়ে যে চূলা ব্যবহার করা হয় তাকেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। চূলা বসাবার জন্য স্বনিযুক্ত কর্মী আছেন। স্বনিযুক্তকর্মীরাই বাড়ীতে এসে এই চূলা তৈরি করবেন। আপনার খরচ হবে মাত্র ৪০ টাকা। পাহাড়ী এলাকার মানুষ, তপসিলী জাতি উপজাতিরা মাত্র ১০০টি টাকা খরচ করে একটা বহনযোগ্য ধাতব চূলা পেতে পারেন।

উন্নতচূলা ব্যবহারের নিয়ম : প্রথমে শুকনো ছোট ছোট কাঠের টুকরো ২৫০ গ্রাম পরিমাণ উনুনে দিন। এবার কাঠের মধ্যে একটু কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রান্না আরম্ভ করুন। যে পাত্রে রান্না করছেন তাতে সমানভাবে তাপ দেবার জন্য অল্প অল্প জ্বালানী দেবেন চূলার মধ্যে। আর হঠাৎ নিভলে ফুঁ দেবার দরকার নেই, কাঠ নিজেই জ্বলতে শুরু করবে উনুনের মধ্যে। জ্বালানী হিসেবে খড় বা পাতা ব্যবহার করতে হলে উনুনের গভীরতা ২.৫ সেমি বাড়িয়ে নেওয়া দরকার কারণ খড় ও পাতা পুড়ে গিয়ে বেশি ছাই বেরিয়ে উনুনের নীচে জমা হবে। কয়লার চূলাতে টানেলের পাইপের মুখ যাতে খোলা থাকে সেদিকে খেয়াল রেখে উনুনে কয়লা অথবা গুল সাজাতে হবে। শীতকালে চিমনীর পাইপ ঠাণ্ডা থাকায় উনুন জ্বালাবার পর ধোঁয়া অনেকসময় পাইপের মধ্যে দিয়ে না বেরিয়ে উনুনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তখন যদি উনুনের মুখে একটু হাওয়া করা যায় তাহলে তাড়াতাড়ি আঁচ পাওয়া যাবে।

উন্নতচূলা কিভাবে পরিষ্কার রাখবেন : ১) রান্না শেষ হলে উনুন খুব ভালো করে পরিষ্কার করে রাখুন। পুরানো কাপড় দিয়ে অল্প গোবর উনুনে ভালো করে মাখিয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন টানেল পাইপে ছাই বা অন্য কিছু না ঢোকে। ২) উনুন দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে উনুনে মাঝে মাঝে মাটি লাগাবার প্রয়োজন হয়। মাটি লাগাবার সময় জ্বালানী ঢোকাবার মুখটা যেন ছোট হয়ে না যায় সেটারও খেয়াল রাখা খুব দরকার। ৩) উনুন জল দিয়ে নেভাবেন না। এতে পাইপ এবং টানেল পাইপের ক্ষতি হতে পারে। আর গরম উনুনে জল পড়ে উনুনের ভিতরের অংশ ফেটেও যেতে পারে। ৪) জ্বালানী হিসেবে কাঠ ব্যবহার করলে ১০-১৫ দিন অন্তর বালির পুঁটুলি দিয়ে চিমনি পরিষ্কার করুন।

উন্নতচূলা ব্যবহারের সুবিধা : ১) ধোঁয়া চিমনী পাইপের মাধ্যমে বাইরে চলে যাওয়ায় ঘরে ঝুলকালি পড়ে না। ২) ধোঁয়াহীন পরিবেশের ফলে বাড়ীর সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং মা ও তার গর্ভস্থ শিশু বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগ থেকে রক্ষা পায়। ৩) উন্নতচূলায় জ্বালানী খরচ অনেক কম হয়। এছাড়া কাঠের ব্যবহার কমলে বনজসম্পদ নষ্ট হয় না ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। ৪) উন্নতচূলায় একই জ্বালানীতে দুটো পাত্রে রান্না করা যায় বলে অনেকটা সময় বাঁচে।

রহস্যের ঘেরাটোপে কোয়াসার

গুরুত্ব দিলেন না। এরপর ১৯৩৭ সাল। গ্রেট রোবার নিজের তৈরি বেতার গ্রাহক ডিসের অ্যান্টেনার মাধ্যমে কার্ল ইয়ান্স্কির সেই আবিষ্কারের সভ্যতা প্রমাণ পেলেন।

১৯৩১ ও ১৯৩৭ সালে কার্ল ইয়ানস্কি ও গ্রেট রোবার যে বেতার তরঙ্গের সন্ধান পেয়েছিলেন তার উৎস ছিল কোয়াসার। কিন্তু তখনও এর সনাক্তকরণ ও নামকরণ হয়নি। ১৯৬০ সালে বিজ্ঞানী অ্যালান স্যানডেজ ও টমাস ম্যাথেউজ এই বিশেষ বিষয়টিকে বিজ্ঞানী মহলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। অবশেষে ১৯৬৩ সালে বিজ্ঞানী মার্টেন স্মিড্ট কোয়াসারের অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিলেন। তখনই জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে মহা আশ্চর্যের বোমা বিস্ফোরণ ঘটল। কোয়াসার নির্গত শক্তিশালী বেতার তরঙ্গই কোয়াসারের রহস্য উন্মোচনের সিংহদুয়ার। এই কোয়াসারকে দেখতে নক্ষত্রসদৃশ বলে এর নাম কোয়াসি স্টেলার অবজেক্ট (Quasi Stellar Object)। এর থেকে বেতার তরঙ্গ নির্গত হয় বলে এর আরেকটি নাম হল কোয়াসি স্টেলার রেডিও সোর্স (Quasi Stellar Radio Source)।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেতার দূরবীনে বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব ও উৎস বিন্দুকে ধরতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের শক্তিশালী আলোক দূরবীন সেই দিকে স্থাপন করা হল। দেখা গেল নক্ষত্রের মতনই এক জ্যোতিষ্ককে। কিন্তু এর স্বভাব চরিত্র নক্ষত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পৃথিবী থেকে এদের বিশাল দূরত্বের হিসাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার ভিত কাঁপিয়ে দিল। পৃথিবীর নিকটতম কোয়াসারের দূরত্ব ৭৮৩ আলোকবর্ষ (১ আলোকবর্ষ = ৯.৪৫ X $১০^{১২}$ কিমি)। 3C147 কোয়াসারের পৃথিবী থেকে দূরত্ব ৬০০ কোটি আলোকবর্ষ। আজ পর্যন্ত মত কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের অধিকাংশেরই গড় দূরত্ব ১০,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) যা আমাদের অনুভূতিকেও ছুঁতে পারে না। বিস্ময় এখানেই শেষ নয়। এই কোয়াসারগুলো প্রচণ্ড গতিতে অনবরত দূরে সরে যাচ্ছে। এই গতিবেগ আলোর গতিবেগের ৯০ শতাংশ (আলো ১ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল যায়)। বিজ্ঞানীরা কোয়াসার থেকে বেরিয়ে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করলেন। দেখলেন এই বর্ণালীর লাল অংশের সরণ (Red Shift) অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। বিজ্ঞানী হাব্‌ল বলেছিলেন, যে জ্যোতিষ্কের লাল সরণ যত বেশি সেই জ্যোতিষ্ক তত অধিক দ্রুততায় দূরে সরে যাচ্ছে। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল প্রতি মুহূর্তে এদের দূরত্ব কি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোয়াসারের লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল এঁদের অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। কয়েক কোটি নক্ষত্র সমৃদ্ধ গ্যালাক্সি থেকেও এদের ঔজ্জ্বল্য কয়েক কোটি গুণ বেশি। আবার এই ঔজ্জ্বল্য পরিবর্তিতও হয়। পরীক্ষা করে দেখা

৬ পাতার পর

গেছে এদের ঔজ্জ্বল্য দিনে ৫০ শতাংশের বেশি পরিবর্তিত হচ্ছে। এরই সঙ্গে বেতার তরঙ্গ বিকিরণের মাত্রারও পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয় এই কোয়াসারগুলোর কোনও কোনওটি থেকে এক্স-রশ্মি বিকিরণ হয়।

কোয়াসার থেকে প্রতিনিয়ত সাংঘাতিক হারে শক্তির বিকিরণ ঘটছে। এর কেন্দ্রস্থলের ব্যাস সামান্য ও ভর চিন্তাতীত। সূর্যের সমান ব্যাসবিশিষ্ট একটা কোয়াসার কয়েক কোটি সংখ্যক সূর্যের ভরসম্পন্ন হয় এবং তার থেকে বিকিরিত শক্তিও কয়েকশো কোটি সংখ্যক সূর্যের বিকিরিত শক্তির সমান। এই বিপুল শক্তি কোনও নক্ষত্রের কেন্দ্রে সংঘটিত তাপ কেন্দ্রীক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়।

বিশাল দূরত্বে অবস্থানকারী, প্রচণ্ড ভরসম্পন্ন ক্ষুদ্র ব্যাসবিশিষ্ট এবং অপরিমেয় আলো ও তাপ বিকিরণকারী কোয়াসারের গূঢ় রহস্য কি? এই বিষয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। কোনও বিজ্ঞানী বলেন কোয়াসার হল গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল। এখানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের সংঘর্ষ হয়। তাদেরই মিলিত ভর কোয়াসারগুলোর বিশাল আলো ও তাপের উৎস। তবে মোটামুটি সর্বজন স্বীকৃত মতটি হল কোয়াসারের কেন্দ্রে রয়েছে ব্ল্যাক হোল অর্থাৎ কৃষ্ণগহ্বর। কৃষ্ণগহ্বর হল এমন এক মহাজাগতিক বস্তু যার ব্যাস অতি সামান্য ও তুলনামূলকভাবে ভর সুবিপুল। বলা যেতে পারে এখানে ১ চামচে যে ভর ধরে তার পরিমাণ ১৫,০০০ মিলিয়ন টন। ফলস্বরূপ এদের মহাকর্ষ বলের প্রভাব এত তীব্র যে এই বলের টানে কৃষ্ণগহ্বর থেকে আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। কৃষ্ণগহ্বরের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে যেসব জ্যোতিষ্ক এর সীমার মধ্যে এসে পৌঁছায়, কৃষ্ণগহ্বর তাকে আত্মসাৎ করে ফেলে। এসব নক্ষত্রের মিলিত শক্তিকেই বিজ্ঞানীরা কোয়াসারের শক্তির উৎস বলে মনে করেন। আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রেও একটি কৃষ্ণগহ্বর বর্তমান। এছাড়াও কয়েকটি পরিচিত কোয়াসার হল—3C48, 3C 147, 3C 196, 3C 273, 3C 286। এইসব কোয়াসারের কেন্দ্রস্থলেও প্রচণ্ড শক্তি বিকিরণকারী কৃষ্ণগহ্বর আছে বলে কোনও কোনও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

কোয়াসারের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বলা হয় এক বিশাল বিস্ফোরণ (Big Bang) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণ। কোয়াসারের আবিষ্কার এই 'Big Bang' নিয়ে মতপার্থক্যের বেশ কিছুটা অবসান ঘটিয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনুমিত বয়স ১৫ থেকে ২০ বিলিয়ন বছর। কিন্তু কোয়াসারের অস্তিত্ব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঠিক বয়স নির্ণয়ের পথ দেখাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। কোনও কোনও কোয়াসার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ৭ শতাংশ বয়সের কোয়াসার। আবার কোনও কোনও কোয়াসার আজ থেকে ২০ বিলিয়ন পূর্বের ব্রহ্মাণ্ডে চিন্তাশক্তিকে নিয়ে ফেলে। তাইতো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক প্রত্যাশা বিস্ময়কর কোয়াসার ভবিষ্যতে বিস্মৃত অতীতের বহু বিস্ময় উপহার দেবে।

—কাকলি সরকার

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। সম্পাদক মণ্ডলী— প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)। ফোন - ২৫৮৫ ৬০৩২, ২৮৭৬ ০৭২০, ২৫৮৮ ০৮২১, ২৫৮৭ ৬২৭৫

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার।